◊ তওবা ও আল্লাহ্‌র স্মরণ ◊

(মূল উর্দু বয়ানঃ মওলানা জুলফিকার আহ্‌মাদ নক্‌শবন্দি)

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম । সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি আসমান যমিনের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, নাই থেকে যিনি প্রাণের সঞ্চার করেছেন, জ্বিন আর মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে আমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তণ করতে হবে । মানুষ গাছ নয় যে দাঁড়িয়ে থাকবে, পাথর নয় যে পড়ে থাকবে । এতো আল্লাহ্‌র এক সৃষ্টি, যার উচিৎ শুধু আল্লাহ্‌র স্বরনে লেগে থাকা । জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র বন্দেগী, আর হায়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র স্বরন । আসল অর্থে বান্দা তো সে'ই যার মধ্যে বন্দেগী আছে, আর তা নাহলে তাতো মিথ্যা আর অনিষ্টের এক নিকৃষ্ট জীব ছাড়া কিছু নয় ।

এ কথা খুব ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে দুনিয়াতে আসা খুব সহজ কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষ হওয়া খুবই কঠিন কাজ । যে সত্যিকার মানুষ হওয়ার ও মানুষ বানানোর চেষ্টা করে কেবল সে'ই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে । এর খবর সবার কাছে থাকে না, কেবল যে এই কাজে লাগে সেই বুঝতে পারে যে এই কাজ কত শক্ত । মানুষ যখন তার অন্তরের পরিশুদ্ধির চেষ্টা করে তখন দেখতে পায় যে তাতে কত দাগ লেগে রয়েছে, আর তা মুছে ফেলে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা কত কঠিন কাজ । এ কাজে লাগার পরই কেবল এর টের পাওয়া যায় । মানুষ যদি নিজের উপর পরিশ্রম করে তবে এত উপরে উঠে যায় যে, আসমানকেও ছাড়িয়ে যায়, আবার এ যদি বিগড়ে তবে এত নীচে নামে যে, জানোয়ারকেও হার মানায় । কঠিন থেকে কঠিন শত্রুও মানুষের এতটা ক্ষতি করতে পারে না যতটা ক্ষতি করতে পারে কোন বিগড়ে যাওয়া মানুষ । তা'হলে কথা হলো পরিশ্রম করলে বনবে, আর গাফলতি করলে বিগড়াবে । আল্লাহ্‌ পাক মানুষের মধ্যে বন্‌বার সিফত্‌ (যোগ্যতা) রেখে দিয়েছেন । এই সিফতের মধ্যে আল্লাহ্‌ পাক এক এক জনকে আল্লাহ্‌র ওলী বন্‌বার গুনাবলী রেখে দিয়েছেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, খুব কম মানুষই এই সিফতের সদ্ব্যবহার করে থাকে । উদাহরন স্বরুপ প্রত্যেক বীজই গাছ বন্‌বার যোগ্যতা রাখে আল্লাহ্‌ পাক এ গুণ তাতে রেখে দিয়েছেন । তবে বীজ থেকে গাছ বনবার জন্য চাই উপযোগী জমি, সময় মত পানি, রোদ আর একজন ভাল রক্ষনাবেক্ষনকারী । কিন্তু সব বীজের কপালে এমন সুযোগ হয়না । ঠিক তেমনি ভাবে সব মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্‌ পাক পরিশুদ্ধ মানুষ বন্‌বার যোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন কিন্তু সবাই পরিশুদ্ধ হয় না । যে ভাল পরিবেশ পায়, আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের মাহ্‌ফিল মজলিস পায় বা কোন ভাল বন্ধু জুটে যায় , কোন নেককার ওস্তাদ পেয়ে যায় বা ভাল বাবা মা মিলে যায় তবে এই পরিবেশের আসরে সে নিজেকে বনবার ও বানাবার সুযোগ পায়, আর আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্য হাসিল করে ।

সাভিক (রঃ) এক বুজুর্গ ছিলেন, তিনি বলতেন ভিখারী বলতে কেউ নেই, সবার কপালেই সবকিছু দেওয়া আছে জানতে হবে শুধু গীট খোলা । আর এই গীট খোলা না জানার কারনেই মানুষ কাঙ্গাল হয়ে ফিরছে । আল্লাহ্‌ মানুষকে ভাল গুণাবলীর হীরা জহ্‌রত দিয়ে রেখেছেন কিন্তু মানুষ তার নফসের গীরা খুলতে জানে না, এই গীরা খোলা বড়ই কঠিন কাজ । আর সে কারনেই মানুষ নামাযও পড়ছে আবার মিথ্যাও বলছে, নামাজও পড়ছে আবার মানুষকে ধোঁকাও দিচ্ছে, নামাজও পড়ছে আবার আল্লাহ্‌র বান্দাদের মনে দুঃখকষ্টও দিচ্ছে, মানুষের হকে ডাকাতিও করছে । নফ্‌স্‌কে সন্তুষ্ট করা কঠিন কাজ নয়, তশবীহ্‌ নিয়ে বসে পড়ছি মুখে লাইলাহ ইল্লাল্লাহ্‌ পড়ে ফেলছি নফ্‌স্‌ খুব খুশী হয়ে যাচ্ছে অথচ অন্তর তার পুরো উল্টো । এটাতো নফ্‌স্‌কে ধোকা দেওয়া হচ্ছে, আর এতে বনার পরিবর্তে বিগড়াবে, ভালর পরিবর্তে খারাপ হবে । জায়নামাজে বসে বন্দেগী কোনই কাজে আসবে না যদি কোন বান্দার হককে নষ্ট করা হয় । কেয়ামতের দিন সে ফকীর হবে, সেদিন সব নেকী তাকে বিলিয়ে দিতে হবে আর লোকদের গুনাহ্‌র বোঝা তার নিজ কাঁধে নিতে হবে ।

আমরা যখন মসজিদে আছি জোর গলায় বলছি আল্লাহু আকবার অর্থ হলো আল্লাহ্ সবচেয়ে বড় কিন্তু এতে আমাদের আজমত্ বা নিগূঢ়তা এমনই যে, যেই আমরা মসজিদের দরজা পার হচ্ছি অম্নি আমাদের দৃষ্টি পড়ছে গায়ের মাহ্রামদের উপর । মসজিদ থেকে কয়েক কদম পর্যন্তই আমরা আমাদেরকে আর সংযত রাখতে পারি না । কারণ আমরা আমাদের নফ্স্কে দাবিয়ে রাখতে পারি না, তার চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য হই । আর এই নফ্স্কে কাবু করার জন্য তার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা চরিত্রে ভরপুর এক পরিশ্রমের প্রয়োজন । এ ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিজ নফ্সের উপর বিজয় লাভ (আল্লাহ্র নেয়ামত) করতে পারলেই কেবল ইবাদাতের রং বদলাবে । আমরা তো আল্লাহ্ আল্লাহ্ জপ্তে জপ্তে জিহ্বা ক্ষয় করে ফেলছি কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে বসছেন না, কেননা আমাদের অন্তরে গুনাহ্র গুটলি পাকিয়ে আছে । এই গুটলিকেই অন্তর থেকে বের করে ফেলতে হবে । সত্যিকার অর্থে ফেরেশতাদের চাইতেও মানুষ অনেক উপরে, তবে মানুষ বনবার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন । কিন্তু পরিশ্রম করে সেই মাকামে পৌঁছুতে পারলে আল্লাহ্ বলেন, আমি তার মহব্বতে পড়ে যাই, আমি ঐ বান্দার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার জবান হয়ে যাই যা দিয়ে সে বলে । কত বড় কথা আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে, কোথায় আমাদের চোখ, কান, হাত আর জবান আর কোথায় আল্লাহ্ পাক, তিনি বলছেন তিনি আমাদের শরীরের অংগ প্রত্যংগ হয়ে যান । আর যদি মানুষ বিগড়ে তবে জানোয়ারের চাইতেও নীচে চলে যায় ।

এখন আমাদের চিন্তার বিষয় আমরা আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্য কতটুকু উপযুক্ত । শারিরীক অবয়বের দিক থেকে আল্লাহ্পাক মানুষকে অপূর্ব অপরুপ করে তৈরী করেছেন । বলেছেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○

''লাকাদ খালাকনাল্ ইনসানা ফি আহ্সানি তাক্বিম '' সূরা ত্বীন - ৪ ।

মানুষকে আমি অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়ে তৈরী করেছি ।

বাহ্যিক অবয়বে তিনি মানুষকে অত্যন্ত সৌন্দর্য দিয়ে তৈরী করেছেন । এমনকি ইমাম সাফী (রঃ) বলেছেন কেউ যদি কসম করেও বলে যে মানুষ জানের (রুহের) চাইতেও সুন্দর তবে সে এতটুকু ভুলও করবে না । কিন্তু রুহানী দিক দিয়ে এই মানুষ অত্যন্ত কমজোর । কোরানে বলা হচ্ছে-

خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

''খুলিকাল্ ইন্সানা দাইফা'' সূরা নিসা - ২৮ ।

মানুষকে খুবই কমজোর করে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

এই কমজোরী হলো রুহানী কমজোরী । আল্লাহ্ আজুলা শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থ হলো এরা সবকিছুতে জলদি করে । হালুয়া মানুয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন মানুষের কমজোরী প্রকাশ করার জন্য । কিন্তু মজার কথা হলো তিনি এক দিকে মানুষের কমজোরী বয়ান করছেন অন্যদিকে ব্যবসাও একতরফা করে নিয়েছেন ।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ○

''ইন্নাল্লা হাশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্নালাহুমুল জান্নাহ্ ''

 সূরা তাওবাহ্ - ১১১ ।

নিঃসন্দেহে জান্নাতের বদলে আল্লাহ্ পাক মুমিনের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন ।

চিন্তা করে দেখেন আমরা যদি কোন জিনিস কিনতে যাই ও সেই জিনিসের কোন দোষক্রুটী আমাদের নজরে পড়ে তবে তা আমরা আর কিনি না । অথচ আল্লাহ্ পাক নিজেই আমাদের কমজোরী বর্ণনা করছেন, আমাদের অন্যান্য সব দোষক্রুটীও তার জানা, তারপরও তিনি একতরফা ভাবে আমাদের জান মালকে খরিদ করে নিয়েছেন । এখন কোরানের মাধ্যমে আমরা এই সুসংবাদ জেনে গেছি যে আল্লাহ তায়ালা একতরফা ব্যবসা করে নিয়েছেন আর আমাদের সমস্ত দোষক্রুটি স্বত্বেও তিনি আমাদের জানমালকে বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন । এই আয়াতকে লক্ষ্য করে একজন পারসী কবি বলেছেন-

''এই আল্লাহ্ আমার সমস্ত দূর্বলতাকে জানার পরও তুমি যখন আমার জানমালকে কিনেই নিয়েছো, দয়া করে আটকিয়ে দিওনা যাকে তুমি নিজেই পছন্দ করে নিয়েছো ।''

আল্লাহ্ পাক কত বড় মেহেরবান যে, সমস্ত দোষগুণ জানার পরও তিনি আমাদের জানমালকে কিনে নিয়েছেন । আমাদের জন্য তো এখন কাজ সহজ হয়ে গেছে । আমাদের উপর এখন কিছু হক এসে গেছে আমরা এখন বিক্রিত, আল্লাহ্ আমাদেরকে কিনে নিয়েছেন । যদি না কিনতেন তবে তো কোন কাজেই আসতাম না । কোন কেনা জিনিসের মালিকানা থাকে, আর অবিক্রিত মালের কোন ওয়ারিশই থাকে না । তাই আল্লাহ্ যখন আমাদের কিনে নিয়েছেন আল্লাহ্র মালিকানা স্বত্ব আমাদের উপর বর্তিয়ে গেছে । আল্লাহ্র সাথে আমাদের যোগসূত্র তৈরী হয়েছে, আমরা এক নিসবৎ পেয়েছি । এরই প্রেক্ষিতে কবি বলছে-

''যতদিন অবিক্রিত ছিলাম কেউ জিজ্ঞাসাও করতো না, এখন কিনে নিয়ে অমূল্যবান করে দিয়েছো ।''

তাই এটা আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট এহ্সান ও কেরাম যে তিনি জান্নাতের বদলে আমাদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন । এখন এগুলো আর আমাদের নয়, আমরা এখন আর আমাদের নই, আমরা আল্লাহ্ পাকের । এখন আমাদের দায়িত্ব আমাদের মনকে বুঝানো যে, আমরা এখন আর আমাদের মর্জিমাফিক নই বরং আমরা আল্লাহ্র মর্জির মুখাপেক্ষি । আমরা যেমন বলি যা মর্জি হবে তাই করবো, এটা ঠিক নয়, যখন কলেমা পড়ে নিয়েছি তখন নিজের মর্জি আর কোথায় থাকে । এখনতো মালিকের মর্জি মতই চলতে হবে, তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে । আল্লাহ্র সাথে আমাদের বন্দেগীর এক সম্পর্ক আছে । এই সম্পর্কের কদর করা খুবই জরুরী । হজরত আলী (রাঃ) একবার একটি কথা বলেছিলেন শুনতে খুবই সাদামাটা কিন্তু স্বর্ণ দিয়ে লিখে রাখার যোগ্যতা রাখে । তিনি বলেন-

''এই আল্লাহ্ আমার ইজ্জতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তুমি আমার পরোয়ারদেগার, আর আমার জন্য এ গর্বই যথেষ্ট যে আমি তোমার বান্দা ''।

আমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র সাথে আমাদের এই সম্পর্কের কদর করা । অন্যথায় আমাদের কোনই মূল্য নাই । আল্লাহ্র মত এমন জাতকেও এ কথা বলতে হয়েছে যে-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ ○

''ওয়ামা কাদারুল্লাহা হাক্কা কাদরি '' সূরা যুমার - ৬৭ ।

এরা আল্লাহ্র কদর করেনি যেমন কদর করা উচিৎ ছিল ।

এমন আয়াত পড়তে হৃদয় কেঁপে উঠার কথা । আজিমুশ্ শান আল্লাহ্ রাববুল আলামিনের শান বর্ণনা করা সমগ্র সৃষ্টির পক্ষেই অসম্ভব । চিন্তায় ও আসার কথা নয় কতখানি বেকদরী হয়ে থাকলে তাঁর মত ক্ষমাশীল হৃদয়বানকেও এ আয়াত নাজিল করতে হয়েছে । এরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কদর করেনি যেমন করা উচিৎ ছিল । না এরা আল্লাহ্র কদর করেছে না কদর করেছে আমার আম্বিয়াদের । এরশাদ হয়েছে-

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

''ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদি মা ইয়াতিহিম্ মিররাসূলিন ইল্লাকানুবিহি ইয়াসতাহ্জিউন''

সূরা ইয়াসীন - ৩০ ।

বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা বিদ্রুপ করেনি ।

প্রথম জামানায় আম্বিয়াদের নিয়ে মজা উড়ানো হতো আর বর্তমানে নবী করিম (সাঃ) এর মোবারক সুন্নাতকে নিয়ে মজা করা হয় । এটাও নবী করিম (সাঃ) কে নিয়ে মজা উড়ানোর মতই । রাহ্মানুর রাহিম ভুলে যাওয়া বান্দার গন্তব্যকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য এক জায়গায় বলছেন-

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○ وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ ○ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ○

''আলাম নাজ্আল্লাহু আইনাঈন, ওয়া লেসানাও ওয়া শাফাতাঈন, ওয়াহাদাইনাহুন নাজ্দাইন ''

সূরা বালাদ - ৮, ৯, ১০ ।

আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, আর জিহ্বা ও ঠোটদ্বয়? এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি?

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ ○

''আলাম নাখ্লুক্কুম্ মিম্মাইম মাহিন '' সূরা মুরসালাত - ২০ ।

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি ?

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○

''আলাম নাজ্আলিল আরদা মিহাদা ? '' সূরা নাবা - ৬ ।

আমি কি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছিয়ে দেইনি ?

'আলাম' শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে তার দেয়া নেয়ামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন । তাতেও বান্দার দৃষ্টি নিবদ্ধ না হলে আল্লাহ্ বড় মহব্বতের সাথে আবার বলছেন-

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ○

''ইয়া আইয়ূহাল ইন্সানু মা গার্রাকা বিরাব্বিকাল কারিম ।'' সূরা ইন্ফিতার - ৬ ।

এই মানবকূল, তোমার মহামহিম পরোয়ারদেগার থেকে, কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিল ?

একদিকে মানুষ নাফরমানী করছে, বেকদরী করছে অন্যদিকে আল্লাহ্ এমন ভাবে বলছেন যেন

কোন মা তার ছেলেকে রাগের সময় নানা ভাবে বুঝিয়ে মানানোর চেষ্টা করছে । আল্লাহ্ পাক বান্দাকে নিজের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছেন । তিনি চাচ্ছেন যে আমার বান্দা আমার দরজায় আসুক এবং সে আমার হয়ে যাক । তারপরও বান্দা যদি ফিরে না আসে তখন আল্লাহ্ তাকে আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছেন-

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

'আলাম আহাদ্ ইলাইকুম ইয়া বানী আদামা আঁল্লা তাবুদুশ্ শায়তানা ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন'

হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তানের দাসত্ব করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

''ওয়া আনি বুদুনী হাযা সিরাতুম্ মুস্তাকিম ।'' সূরা ইয়াসিন - ৬০, ৬১ ।

আর আমার এবাদত কর, এটাই সরল পথ ।

এখন চিন্তা করা দরকার যে, এত সব কিছুর পরও আমরা আমাদের মনমর্জি মতই আমাদের জীবন পরিচালিত করে যাচ্ছি । নফ্স্ এবং শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে । এমন কাউকেই পাওয়া যাবেনা যে, নেককার হতে চায়না । সবারই মনে মনে এই খেয়াল আছে যে নেককার হয়ে যাব । কিন্তু নফ্স্ আর শয়তান কিছুতেই তওবা করার সুযোগ দেয়না । আমাদের মুখে গুনাহ্র ললিপপ ঢুকিয়ে রেখে তওবা করা থেকে পিছিয়ে রাখে, এভাবেই সময় অতিক্রান্ত হতে থাকে । এক বুজুর্গ এমন বলতেন যে, এই বন্ধু তওবা করে নেবে এই মনে করে গুনাহ্ করতে থাকা, আর আরো বেঁচে থাকবে এই মনে করে তওবাকে পিছি হটাতে থাকা তোমার জ্ঞানের চেরাগ নিভে থাকার পরিচয় বহন করে । তো মানুষ মনে করে যে তওবা করে নেব, কিন্তু এ কথা চিন্তা করে না যে এখনই তওবা করা দরকার । শয়তান মনের মধ্যে এমন ভাবের উদয় করে দেয় যে, তুমিতো তওবা করতেই পারবে না, তোমার জন্য তো গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয় । তুমি তো কয়েক দফা গুনাহ্ ছাড়ার এরাদাও করেছিলে, কই পেরেছো কি ? একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের জন্য গুনাহ্ ছাড়া কঠিন, আমাদের জন্য গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, কিন্তু আমাদের পরোয়ারদেগারের জন্য আমাদেরকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখা তার জন্য খুবই সহজ কাজ । তো আমরা আল্লাহ্র রহমতের উপর কেন নজর রাখবোনা ? আমার জন্য বেঁচে থাকা কঠিন কিন্তু আমার পরোয়ারদেগারের জন্য তো বাঁচিয়ে রাখা খুবই সহজ । উনি চাইলে আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন । আমরা উনার রহমতের উপর দৃষ্টি দেব । শয়তান আবার মনে এই ভাবেরও উদয় করে দেয় যে, তওবা তো তুমি করে নেবে কিন্তু কিছু সময় পরেই তো আবার গুনাহ্ করে ফেলবে, তাহলে তোমার তওবা করেই লাভ কি ? এটা অনেক বড় ধোঁকা । মনে হবে তাইতো তাহলে তো এমন তওবা করে কোন লাভ নাই । না তারপরও তওবায় লাভ আছে । তওবা করার সময় পাক্কা এরাদা করে নিতে হবে যে, এমন গুনাহ্ আর করবো না । তারপরও যদি আবার গুনাহ্ হয়ে যায় তবে পূর্বের তওবার উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না । তওবার নিয়ম হ'লো কেউ যদি খালেস মনে তওবা করে নেয় তবে তার জীবনে আজ পর্যন্ত করা সমস্ত গুনাহ্কে মিটিয়ে দেওয়া হয় । এটা কতবড় কাজ, এই জন্য তওবায় কখনই দেরী করতে নাই ।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ ○

‘‘ ইন্নামাত্ তাওবাতু আলাল্লাহি লিল্লাজিনা ইয়া মালুনাস্সু আবি জাহালাতিন সুম্মা ইয়াতুবুনা মিন কারিব ।’’ সূরা নিসা - ১৭ ।

অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয় ।

মোফাস্সিরিনগণ লিখেছেন, কোন মানুষ যখন কোন কিছুর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায় তখন সে আলেম হওয়া স্বত্বেও জাহেল হয়ে যায় । আর জাহেলির কারনে করা গুনাহ্ মাফ করা আল্লাহ্র দায়িত্ব । যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে নিতে পারে তা ঐ ‘কারিব’ শব্দের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যায় । তো আমরা সত্যিকার তওবা করলে আমাদের পিছনের যত গুনাহ্ আছে তার সবই মাফ করে দেওয়া হবে । আর সামনের জন্য নতুন হিসাব শুরু হবে, তাহলে বোঝা কত কমে গেল । এই জন্য তওবার জন্য কখনই দেরী করতে নাই । আর বার বার তওবা করতেই থাকতে হবে । আর শয়তান যদি মনের মধ্যে এই ইন্ধন জোগায় যে, তুইতো আবার গুনাহ্ করবি তবে ওকে বলতে হবে যে, যদি আবার গুনাহ্ করি তবে আবার তওবা করে নেবো । এটা আল্লাহ্ পাকের আরেকটা অদ্ভুত গুন যে আবার তওবা করলে তিনি তা আবারও কবুল করে নেন । এর উদাহরন স্বরুপ কেউ যদি খুব ঘেমে যায় আর তা থেকে তার কাপড় ময়লা হয়ে থাকে, তবে গোসল করে নিয়ে নূতন কাপড় পরে নিলেই হলো । এখন যদি সে মনে করে যে গোসল করে কি লাভ আমি তো আবার ঘেমে যাব তাহলে কি তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে ? বরং ঘামার কারনে বার বার গোসল করে নতূন কাপড় পরে নিলেই তাকে সবাই বুদ্ধিমান বলবে । তেমনি ভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হলো বার বার গুনাহ্র ঘাম এসে গেলে বার বারই তওবার গোসল করে নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া । অবশেষে আল্লাহ পাকতো গুনাহ্র ঘাম থেকে পরিত্রান দেবেন ও নেকীর এয়ার কন্ডিশন রুমে বসিয়ে দেবেন, আর গুনাহ্র ঘাম আসবেই না । আর খোদা না করুন যদি এসেই যায় আবার তওবার গোসল করে নিলেই হলো । মজার কথা হলো শয়তান যদি আমাকে বার বার গুনাহ্ করানো থেকে পিছপা না হয় আমরা কেন বার বার তওবা করা থেকে বিরত হব । যদি শয়তানকে কাবু করা সম্ভব নাও হয়, তাই বলে হাতপা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা কেন, অন্তত নিজ শক্তি দিয়ে চেষ্টা তো করতে থাকতে হবে । এক বুজুর্গ বলেন নফসের সাথে আমাদের এই কুস্তি সারা জীবনের, তাতে কখনো হয়তো নফস্ জিতবে আর কখনো আমরা । তাই নফ্সের উপর জিত আসার সাথে সাথেই আমরা তওবা করে নেব । এখন কেউ যদি বলেন যে আমাকে আমার নফস্ই সারা জীবন দাবিয়ে রেখেছে আমি কোন দিনই তার উপর জিততে পারিনি । তার জবাবেও সেই বুজুর্গ বলেন, সারা জীবন ধরে নাকাম হতে থাকলেও বাহ্যিক চেষ্টা যেন আমরা না ছাড়ি কেননা আল্লাহ্র সাথে মহব্বতের এ সম্পর্ক যতবারই ছিড়ুকনা কেন ততবারই জোড়া লাগে । তাই গুনাহ্র দ্বারা শয়তান যদি শতবারও এই সম্পর্ককে কেটে দেয় আমাদের উচিত তৌবাহ্র দ্বারা আবার সেই সম্পর্ককে জুড়ে দেওয়া । জীবনের শেষ পর্যন্ত তওবার দ্বারা আমাদের এই ভালবাসার সম্পর্কের সাথে নিজেদের জুড়ে রাখা দরকার । আর এই তওবায় কখনই দেরী করা উচিত নয় ।

হজরত মুফতি মোহম্মদ হাসান (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন এমন একজন হবে যে অগণিতবার গুনাহ্ করেছে, আবার যতবারই গুনাহ্ করেছে ততবারই তৌবাহ্ করেছে, আর এর সবকিছুই তার আমল নামায় লেখা থাকবে । আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবেন দেখ শয়তান একে দিয়ে যতবারই গুনাহ্ করিয়ে ফেলেছে সে ততবারই আবার তওবা করে দাঁড়িয়ে গেছে, আসলে সে চেষ্টা করেছে দাঁড়িয়ে থাকতে অতএব আমি তার এই এরাদার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দাঁড়ানোদের (নেককারদের) মধ্যে সামিল করে নিচ্ছি । তাই আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশায় দেরী না করে তাড়াতাড়ী আমাদের তওবা করে নেওয়া উচিত । আল্লাহ্ বড়ই খুশি হন যখন কোন বান্দা সত্য তওবা করে । তওবা আমাদের জন্য এক বিরাট বড় নেয়ামত যার অসিলায় পিছনের জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়ে নেওয়া সম্ভব । কম্পিউটারের ইরেজ কমান্ড দিয়ে যেমন সবকিছুকে মুছিয়ে দেওয়া সম্ভব তেমনিভাবে জানা অজানা সমস্ত গুনাহ্র জন্য তওবার ইরেজ কমান্ড দিয়ে সব গুনাহ্কে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব যেন তা কখনো করাই

হয়নি । তাই আমরা কেন এই রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো না । নেককারদের মাহ্‌ফিলে বসলে মনের উপর ভাল আসর পড়ে, আর এই সুযোগে আমরা তওবা করে নেই । যার মনে এমন হয় যে, সে কিছুতেই তওবা করতে পারবে না আল্লাহ্‌ তাকেও তওবা করার সুযোগ দান করুন । তাই আমরা তওবা করার মাধ্যমে হামেশা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি, আর নেককারের জীবন যাপনের জন্য মনে মনে এরাদা করে নেই ।

আমরা যদি মানি যে কেয়ামতের দিন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হতে হবে তবে এ হাজিরা কেবল দুই উপায়েই হতে পারে । হয় তার ফরমান বরদার হিসাবে, নয়তো নাফরমান হিসাবে । যদি গোলাম হিসাবে হাজির হতে পারি তবে আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সাথে দেখা দিবেন আর নাফরমানদের জন্য হবে কঠিন সাজা । কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে ভালভাবে দেখা হওয়ার জন্য দুইটা জিনিসের দরকার যা ভালমত আমাদের অন্তরে বসিয়ে নেওয়া দরকার । একতো অন্তরে আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে মুবারক মুলাকাতের সখ, যার কারনে মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর ইবাদাতে লেগে থাকবে । হুজুর বর্ণনা করেন এই ধরনের বান্দাকে আল্লাহ্‌ এমনভাবে অভিভাদন জানাবেন যেমন নাকি পরদেশ থেকে বহুদিন পর ফিরে আসা ছেলের জন্য তার বাবা মা করে থাকে । দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হওয়ার ভয়, যা মানুষকে গুনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে রাখে । আল্লাহ্‌র সাথে দেখা হওয়ার সখ মানুষকে মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে নেকী করিয়ে নেয় আর আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবার ভয় মানুষকে ছোট বড় গুনাহ্‌ থেকে বাঁচিয়ে রাখে । তো এই দুই জিনিস ‘সখ’ আর ‘ভয়’ আমাদের মধ্যে হতে হবে ।

এমন এক সালেহীন ছিলেন যিনি তার এই সখের কারনে দিনরাত ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন আর গুনাহ্‌র ধারে কাছেও যেতেন না । এই উম্মতের মধ্যে এমন বান্দাও পার হয়ে গেছেন যার গুনাহ্‌ লেখক ফেরেশতার ২০ বছর পর্যন্ত কোন গুনাহ্‌ লেখবার সুযোগ মিলেনি । ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) ৪০ বছর পর্যন্ত ঈশার অযুতে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন । অনেকে এটার সমালোচনায় বলেন যে এটা কেমন কথা যে ৪০ বছর যাবত তার অযুই ভাংলোনা তিনি কারো হকও আদায় করলেন না । এটা আমাদের ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে কিছু কথা উরফে বলা হয়ে থাকে । যেমন কোন লোক শিক্ষকতা করতে করতে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো । এখন মানুষ তাকে বলে যে এই লোক তো তার সারা জীবন পড়াতে পড়াতেই শেষ করে দিল । এর অর্থ কি জীবনে সে কখনোই ছুটি পায়নি ? এমনি ভাবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর ৪০ বছরের ইবাদাতের উল্লেখ করে উনার চিরাচরিত অভ্যাসকে বুঝানো হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, এর মাঝে কোনদিন অযুই ভাংগেনি । তিনি নামাজের মাঝে এমনই অনড় থাকতেন যে, পাশের বাসার ছোট ছেলে তাকে ছাদের উপরের মিনার মনে করতো । ইমাম আযমের ওফাতের পরদিন সেই বাচ্চা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে, ঐ মিনারা কোথায় গেল তা ভেংগে গেছে কিনা । এই রকম যেভাবে এবাদতের হক আছে সেইভাবে উনারা ইবাদাত করতেন । একেই বলে আল্লাহ্‌র সাথে মুলাকাতের সখ ।

ইমাম রব্বানী নামাজের আহ্‌মিয়াত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে দুনিয়াতে মানুষের নামাযের যে অবস্থা হবে আখেরাতে তার সাথে আল্লাহ্‌র আচরনও তেমন হবে । এখন কেউ যদি এমন নামাজ পড়তে পারে যে, সে নামাযে তার আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন কিছুরই খেয়াল না থাকে তবে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌র দিদার নসীব হবে তখন আল্লাহ্‌ ও তার মাঝে কোন পর্দা থাকবে না । আর কারো নামাযে যদি এদিক ওদিককার খেয়াল আসে তবে সে যদি জান্নাতে চলেও যায় আর তার যদি আল্লাহ্‌র দিদারও নসীব হয়ে যায় তবে তার নামাজে যত খেয়াল এসেছিল আল্লাহ্‌ ও তার মাঝে ততগুলি পর্দা পড়ে যাবে । তাই কাল কেয়ামতে যে কোনরুপ পর্দা ছাড়াই আল্লাহ্‌কে দেখতে চায় তার উচিত ঐ রকম নামায পড়ার চেষ্টা করা যাতে এক আল্লাহ্‌র ধ্যান ছাড়া আর কিছুই না থাকে । আমরা কি এর জন্য আদৌ চেষ্টা করছি ? না আদৌ এর জন্য কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা আমাদের আছে । এই যে আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য্য, এরা আসলে তো নামায শিক্ষা দেয়,

এদের সাথে কিছুদিন থেকে দেখেন, চলে দেখেন, আপনাদের নামাযে পরিবর্তন আসবে, আন্তরিকতা ও ধ্যান বাড়বে । প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর মনের আকাংক্ষা এই হওয়া উচিত যেন আমাদের কপালে এমন নামায নসীব হয় যেন তাতে বাহিরের কোন খেয়াল না থাকে, আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দিদার নসীব হলে যেন মাঝে কোন পর্দা না থাকে ।

ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (রঃ) এর সময়ে এক কর্মকার ছিল সে সারাদিন লোহার জিনিসপত্র বানানোর কাজে ব্যস্ত থাকতো । এই কর্মকারের অনেক ছেলে মেয়ে ছিল । ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের মৃত্যুর পর একদিন তারও মৃত্যু হলো । বহুদিন পর এক বুজুর্গ ঐ কর্মকারকে স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন আছো ? উত্তরে তিনি বলেন আমাকে ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের সমান দরজা দেওয়া হয়েছে । এ শুনে লোকজন সব হয়রান হয়ে গেল, কোথায় ইমাম হাম্বল এর মত এবাদতগুজার নেক ও সালেহ্‌ বুজুর্গ আর কোথায় একজন লোহা কুটনেওয়ালা । সবার মনে একই প্রশ্ন কেন একজন সাধারন ব্যক্তিকে এতবড় দরজা দেওয়া হলো ? কেউ এর তত্ব বের করতে না পেরে অবশেষে তারা তার স্ত্রীর কাছে গেল জানার জন্য, তার অন্য কোন অসাধারন আমল ছিল কিনা । তার স্ত্রী তাদেরকে তার সম্পর্কে দুইটি কথা বলেঃ এক- তার কাছে আল্লাহ্‌র আদব সবচেয়ে বড় ছিল । আল্লাহ্‌কে তিনি এতই বড় জানতেন যে, সে লোহায় হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করতে করতে যদি হাতুড়ী উপরে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে যেত তবে সে উপরে তোলা ঐ হাতুড়ী দিয়ে আর আঘাত না দিয়ে আস্তে করে হাতুড়ী নামিয়ে রেখে দিত । বলতো যে, আজান হয়ে গেছে আমি প্রথমে নামাজ পড়বো তারপর কাজ করবো । আল্লাহ্‌র নামের আজমত অন্তরের এতই গভীরে ছিল যে দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে পরাজিত হয়েছে । আজানের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গোটা পৃথিবীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে । দুই- রাতে ক্লান্ত শরীরে যখন বাচ্চাদের নিয়ে বিশ্রামের জন্য ছাদে যেতেন, পার্শ্ববর্তী ছাদে ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (রঃ) সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন । আর এই দেখে তিনি দীর্ঘ শ্বাস ফেলতেন আর বলতেন আমি কি করবো, আমার উপরে তো অনেক বোঝা, এতগুলো ছেলে মেয়েকে খাওয়ানো পরানোর জন্য তো আমাকে দিনভর পরিশ্রম করতে হয় আর সে কারনে রাতে আমাকে পরিশ্রান্ত থাকতে হয়, আর তা না হলে আমিও ইমাম হাম্বলের মত সারা রাত ইবাদত করে কাটিয়ে দিতাম । এই যে ইনার অন্তরে ইমাম হাম্বলের ইবাদতের মত ইবাদত করার আকুতি ছিল, আল্লাহ্‌ তার অন্তরের এই আকুতিকেই কবুল করে নিয়েছেন ও তিনাকে ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (রঃ) এর সমান দরজা দান করেছেন ।

আমাদের হয়তো এমন নামায পড়ার যোগ্যতা নাও থাকতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজ আমাদের অন্তরে এমন নামাজ পড়ার কোন ইচ্ছাই জাগে না । মনে মনে এমন ইচ্ছা রাখতে তো কোন অসুবিধা ছিল না, অথচ আজ আমরা তা থেকেও বহু দুরে । দুর্ভাগ্য আমাদের মনে মনে তামান্না করতেও আজ আমরা বড়ই কৃপণ । কবি বলছে- তোমাদের দোয়ায় তো নিয়ম বদলিয়ে যেতে পারে না, এর চেয়ে ভাল এই যে তোমরাই বদলিয়ে যাও । তোমাদের দোয়া তো যেন তোমাদের মনষা পূরন হয়, আর আমার দোয়া হলো যেন তোমাদের মনষাই বদলিয়ে যায় । আল্লাহ্‌ যেন আমাদের মনষাকেই বদলিয়ে দেয় । আজ আমরা দুনিয়াকে মনষা বানিয়ে নিয়েছি । আল্লাহ্‌ করে আমরা যেন রাত জেগে ইবাদত করতে পারি, কোরানকে বেশী বেশী করে মুখস্ত করতে পারি, আমরা নেককার বনতে পারি, পূর্ণ ধ্যানের সাথে নামায পড়তে পারি । এই রকম নেকীর সখ যেন আমাদের মধ্যে এসে যায় । এই রকম নেকীর সখ আসলে মানুষ লুকিয়ে চুরিয়ে নেকী করতে থাকবে । আবার আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে হাজিরার ভয়ে মানুষ অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবে । মনে এমন ধারনা হবে যে, আমি যখন আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হব তখন আমার কি হবে ।

এমন উদাহরন অনেক আছে যেমন- হজরত আবু বকর (রাঃ) এর মত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বও বলতেন হায় আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন, হায় আমি যদি ঘাস লতা পাতা হতাম তবে আমাকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজিরই হতে হতো না, হায় আমি যদি কোন মুমিনের

শরীরের লোম হতাম । এই বক্তব্য কার যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব (সাঃ) বলেছেন আমি সবার সবরকম এহ্‌সানের বদলা দিয়ে দিয়েছি শুধু আবু বকরের বদলা দিতে পারিনি, যার বদলা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন নিজ হাতে দেবেন । হজরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে এমন কথা জানা যায় যে, উনি এত বেশী কান্নাকাটি করতেন যে চোখের নীচের দিকে চোখের পানির দাগ পড়ে গিয়েছিল । তিনি একবার হজরত হুযায়ফা (রাঃ) ডেকে বললেন যে, আমি জানি আপনাকে হুজুর পাক (সাঃ) মুনাফেকদের নাম বলেছেন, আর এও জানি যে আপনাকে কারো কাছে এই নাম বলতে নিষেধও করে দিয়েছেন , আমি আপনার কাছে মুনাফিকদের নাম জিজ্ঞেস করছি না আমাকে শুধু এতটুকু বলে দিন যে, আমি ওমরের নামও ওর মধ্যে সামিল নাকি । আর যখন মৃত্যুর সময় ঘনীয়ে এসেছে সাহাবাদের ডেকে নিয়ে বলেছেন - আমি নসিহত করে যাচ্ছি যে আমার মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ী আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে দেবে ও তাড়াতাড়ী আমাকে দাফন দিয়ে দেবে । উনি বারবার এই কথা বলতে থাকলে একবার এক সাহাবি প্রশ্ন করে বসলেন যে, আমরা আপনার দাফনের জন্য তাড়াহুড়া করবো তো ঠিক কিন্তু মৃত্যুর পরে আপনার কেন এই তড়ীঘড়ী । হজরত ওমর (রাঃ) এর জবাবে বলেন - আমি তো জল্‌দি এই জন্য করছি যে, যদি আল্লাহ্‌ আমার উপর রাজী হয়ে থাকে তবে জলদি আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে মিলিয়ে দিও । আর আল্লাহ্‌ যদি আমার উপর নারাজ থাকে তবে জলদি করে তোমাদের কাঁধ থেকে এই বোঝাকে সরিয়ে দিও । ওমরের অবস্থা তো আল্লাহ্‌ খুব ভালই জানেন ।

এমনিভাবে উম্মতের মধ্যে আরো বহু আউলিয়া চলে গেছেন যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় অত্যন্ত গভীর ছিল । যেমন আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক (রঃ) এক বড় মুহাদ্দেসিন ছিলেন যার কাছে এক সাথে ৪০ হাজার লোক বসে হাদিস শুনতো । তখনতো মাইক ছিল না, এই কারনে হাদিস শুনানোর জন্য মুকাব্বের নিযুক্ত করা হতো, একবার এই মুকাব্বের এর সংখ্যাই ছিল ১২শ । লাখো ছাত্র উনার কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন । যখন উনার মৃত্যুর সময় আসলো উনি সাগরেদদের বললেন আমাকে চৌকি থেকে নীচে নামিয়ে দাও । সাগরেদরা কাচুমাচু করছিল, অবশেষে ওস্তাদের কথায় সায় দিয়ে তারা তাকে খালি যমিনের উপর শুইয়ে দেয় । তিনি খালি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিজ দাড়ি রগড়িয়ে বলতে থাকেন, এই আল্লাহ্‌ এই বুড়া আব্দুল্লাহ্‌র উপর রহম কর । উনি এই কথা বলেননি যে, আমি তোমার বান্দাদের হাদিস পড়িয়েছি, একথাও বলেননি যে আমি তাদের নেকীর দিকে ডেকেছি, একথাও বলেন নি যে তোমার ভুলে যাওয়া বান্দাকে আমি তোমার সাথে জুড়ে দিয়েছি, জীবনের কোন আমলেরই উল্লেখ করেননি, শুধু নিজের চুলকে ধরে বলেছেন যে, হে আল্লাহ্‌ বুড়া আব্দুল্লাহ্‌র উপর রহম করুন । এমনিভাবে আহ্‌মদ আলী নামে একজন বহুত বড় বুজুর্গ ছিলেন । জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌র ভয়ে খুব কান্নাকাটি করতেন । তিনি মারা যাওয়ার পর তার কবর থেকে খসবু আসতে থাকে । মানুষ জন কবরের দিকে ঝুকে পড়ে । পরে খসবু বন্ধ হয়ে যায় । উনাকে একবার কেউ স্বপ্নে দেখেন । জিজ্ঞেস করেন আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে । উনি উত্তর দেন- আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আহ্‌মদ আলী তুমি কেন এত কাঁদতে ? আমি তো ভয়ে আরো ঘাবড়িয়ে যাই যে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে । আমার ঘাবড়ীয়ে যাওয়া দেখে আল্লাহ্‌ বলেন যে, এই আহ্‌মদ আলী তুই আজও ভয় পাচ্ছিস, আজ তো তোর একরামের দিন । আমি তো তোর মাগফেরাত করেছিই, আর তোর ওসিলায় যেই কবরস্থানে তোকে দাফন করা হয়েছে ঐ কবরস্থানের সবাইকে মাগফেরাত করে দিয়েছি । তো আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে তাদের এই রকম পুরস্কার মেলে যে তার কারনে অন্যদেরও মাগফেরাত হয়ে যায় ।

আল্লাহুআকবার । আল্লাহ্‌র সামনে হাজিরার ভয় । এক আল্লাহ্‌ ওয়ালা কিয়ামতের দিন হাজিরার কথা ভাবতে ভাবতে ভাবছেন যে, যদি হুজুরে পাক (সাঃ) এর সামনে আমাদের দোষকে উন্মোচন করা হয়, তবে আমাদের কতই না লজ্জার ব্যাপার হবে । এইখানে আল্লামা ইকবাল বলেছেন- এই আল্লাহ্‌ তুমিতো সব জান, আমিতো তোমার দরজার ফকির, কিয়ামতের দিন আমার দোষগুলোকে ঢেকে রাখিও, আর হিসাব নেওয়া যদি তোমার একান্তই কাম্য হয়, তবে

আড়াল করে নিও, যেন তোমার হাবিবের সামনে আমার দোষ গুলো প্রকাশ না হয়ে যায়, আর আমাকে তার সামনে সর্মিন্দা হতে হয় । একবার হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) আল্লাহ্র কাছে খুব কান্নাকাটি করছেন, বলছেন এই আল্লাহ্ আমার মাগফেরাত করে দিন, এই আল্লাহ্ আমার মাগফেরাত করে দিন, অবশেষে একবার বলে ফেলেছেন আর যদি মাগফেরাতের ফায়সালা তোমার কাছে না হয়, তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে তুলিও যেন তোমার সব পাক বান্দাদের সামনে আমাকে সর্মিন্দা না হতে হয় । তাই আল্লাহ্ যেন আমাদের অন্তরে আল্লাহ্র সাথে দেখা করার সখ জাগ্রত করে দেন যেন আমাদের দ্বারা লুকিয়ে লুকিয়ে নেকী করা সম্ভব হয় । আর আমাদের অন্তরে যেন আল্লাহ্র সামনে হাজির হওয়ার ভয় জন্মে যেন আমরা সবরকম অন্যায় ও গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারি । আমিন, সুম্মা আমিন, আলহাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল্ আলামিন ।